অন্ধকার

সৈয়দ বখতিয়ার

সা
প্র
সাগরিকা প্রকাশনী

অন্ধকার

সৈয়দ বখতিয়ার

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৬

প্রকাশক

চাষী এসকে খান

সাগরিকা প্রকাশনী

গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

মোবাইল: ০১৭৩১-৫৬৪১৬৪, Email: sagorikaprokasoni@gmail.com

বর্ণবিন্যাস

মোঃ জহির উদ্দীন

প্রচ্ছদ

মোঃ জহির উদ্দীন

মুদ্রণে

সাগরিকা প্রিন্টার্স

২৮/১, রূপচাঁদ লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ১৮০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-29056-0-0

Ondhokar Written by Sayed Bokhtiar,
Published by **Sagorika Prokashoni**
Gazipur Chowrasta, Gazipur, Bangladesh.

Price: One Hundred Eighty Tk Only.

উৎসর্গ

নভোনীল প্রি-স্কুল, খুলনা

কাল বৈশাখী ঝড়ের রাত।

তখন প্রায় দুইটা। খুলনার আকাশে সেই রাতে মেঘ জমেছিল ধীরে ধীরে, বিকাল থেকেই। বিকেলের দিকে খুলনা রেলস্টেশনের আশপাশের লোকজন বলাবলি করছিল আজ রাতে বড়োসড় ঝড় আসতে পারে । শিববাড়ি মোড়ের ব্যবসায়ীরা আকাশের রং দেখে বুঝতে পারে। সেই মেঘের রং ছিলো কালো অনেক কালো সাথে মাঝে মধ্যে হালকা বাতাস মাঝে খুব জোরে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল । খারাপ লক্ষণ।

কিন্তু মিরাজের ঝড় নিয়ে কোন চিন্তাই ছিল না সে সব সময় তার পরিবারকে নিয়েই চিন্তা করত । সে জানত শুধু একটাই হিসাব রাতের শেষ ট্রেন পর্যন্ত চায়ের দোকান খোলা রাখলে আরও পঞ্চাশ-ষাট টাকা আসে। আর ষাট টাকা মানে পরদিন সকালের বাজার।

মিরাজের বয়স বত্রিশ। চেহারায় বয়স আরও বেশি লাগে— রোদে পোড়া, খাটুনিতে ক্লান্ত একটা মুখ। স্টেশনের পূর্ব গেটের পাশে তার একটা ছোট চায়ের দোকান। কাঠের বেঞ্চ, একটা বড় কেটলি, কিছু চায়ের কাপ আর একটা ছোট প্লাস্টিকের টুল এটুকুই তার সম্পদ। সে এখানে চা বিক্রি করে সাত বছর ধরে। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় এসে রাত বারোটার পরে যায়।

সেই রাতে ঝড় এল হঠাৎ করে। আগে বৃষ্টি, তারপর হাওয়া, তারপর আবার বৃষ্টি দমকা দমকা। মিরাজ তাড়াহুড়ো করে তার জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল। চিনির বয়াম কাগজে মুড়িয়ে ব্যাগে ভরছিল। তখন তারা এল।

চারজন। বয়স বড়জোর তেরো থেকে পনেরোর মধ্যে। পোশাক ছেঁড়া, মুখে পলিথিনের থলে— ড্যান্ডি শোঁকার পুরনো অভ্যাস। মিরাজ তাদের চিনত। এ স্টেশনের আশেপাশেই থাকে। মাঝেমধ্যে পয়সা দিলে চা খায়। মাঝেমধ্যে চুরিও করে।

মিরাজ হাত তুলল— "যা, এখন না।"

কিন্তু তারা থামল না।

প্রথম ছেলেটা বলল, "দাদা, পঞ্চাশ টাকা দে।"

মিরাজ বলল, "এখন টাকা নাই অনেক সমস্যার ভিতর আছি এখন তোরা যা।"

মিরাজ তাদের কোমরে দেখল ছুরি আছে। মিরাজ বুঝল এদের চোখ শুধু টাকার দিকে না, একটা নেশার ক্ষুধাও আছে। সেই ক্ষুধা ভয়ংকর। সে একটু পিছিয়ে গেল— "ভাই, আমার পেটে কিছু নাই, ঘরে গিয়া দেখবি দুই ছেলেমেয়ে না খেয়া আছে।"

কথাটা সত্যি ছিল। আংশিকভাবে।

কিন্তু সেই রাতে কথা শুনল না কেউ।

ঝড়ের গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল মিরাজের শেষ কথাগুলো। কেউ শুনল না। স্টেশনের পাশের গলিটা সেই রাতে একদম ফাঁকা ছিল। বৃষ্টির কারণে সবাই ভেতরে।

একটা মোটা ভাঙা পাইপ।

তিনটা আঘাত।

মিরাজ মাটিতে পড়ে গেল। বৃষ্টির জল আর রক্ত একসাথে গড়িয়ে গেল নর্দমার দিকে। ছেলেগুলো তার কোমর থেকে মানিব্যাগ টেনে নিল। ভেতরে ছিল একশো বিশ টাকা আর একটা রশিদ— এক মাসের বকেয়া ভাড়ার।

তারা পালিয়ে গেল অন্ধকারে।

মিরাজ বৃষ্টির মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে রইল। চোখ খোলা। আকাশের দিকে তাকানো। মেঘগুলো দ্রুত ছুটছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার ঠোঁট একবার নড়ল— হয়তো কিছু বলতে চাইছিল। হয়তো কারও নাম।

হয়তো রহিমার নাম।

সেই একই রাতে, খুলনা রেল স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে, একটি বস্তির ঘরে একটি শিশু পৃথিবীতে এল।

রহিমা বেগম, মিরাজের স্ত্রী, আট মাসের পেট নিয়ে একা ঘরে শুয়ে ছিল। পাশের ঘরের আয়েশা বুয়া তাকে ধরে ছিল। ধাত্রী আসার আগেই শিশুটি এল— দ্রুত, তীব্র, যেন সে জানত বাইরে ঝড় আছে এবং জগতে আসতে দেরি করা ঠিক না।

একটা ছেলে সন্তান এর জন্ম হল

ছোট মুখ। বড় চোখ। জন্মের পরপরই সে থামেনি— হাত-পা ছুড়তে লাগল এত জোরে যে আয়েশা বুয়া বললেন, "এই পোলা বড় হলে অলিম্পিকে দৌড় দিবে।"

রহিমা হাসল ক্লান্ত মুখে।

সে জানত না তখনও। জানত না যে স্বামী আর ফিরবে না। জানত না যে বৃষ্টি থামলে পরদিন সকালে এক পুলিশ এসে দরজায় কড়া নাড়বে। জানত না যে সেই ছোট্ট শিশুর জন্য যে লড়াই সামনে অপেক্ষা করছে— তা তার সমস্ত শক্তিকে ভেঙে দেবে।

সে শুধু জানল— তার একটি ছেলে হয়েছে।

ঝড় তখনও চলছে। বাইরে বৃষ্টি। ভেতরে একটি নতুন প্রাণ।।

পরদিন।

মিরাজের মৃত্যুর খবর পেল রহিমা পরদিন ভোরে।
সাব-ইন্সপেক্টর আরিফ হোসেন এসেছিলেন একা। দরজায় দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "আপনে মেহেদী মিরাজের বউ?" রহিমা মাথায় কাপড় দিয়ে দরজা খুলল। পাশে শিশু। কোলে না— বিছানায়। রাতে ঘুমায়নি।
আরিফ সাহেব বললেন কথাটা।

রহিমা কিছু বলল না। শুধু দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আরিফ সাহেব একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। তিনি অনেক খারাপ খবর দিয়েছেন জীবনে। কিন্তু এই নারীর চোখ দুটো তাকে অস্থির করে দিল। কান্না নেই। শুধু একটা শূন্যতা— যেন কেউ মনের ভেতর থেকে সব আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে।
"লাশ নিতে হবে", বললেন তিনি।
রহিমা ঘুরে গেল ঘরের ভেতরে।

মিরাজের মৃতদেহ দাফন হলো তিন দিন পর। এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব পড়লেন। বস্তির দু-চারজন প্রতিবেশী এল। আর কেউ না। রহিমার বাপের বাড়ি বরিশাল— খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু গাড়ির ভাড়া নেই বলে কেউ আসতে পারেনি।
মিরাজের চায়ের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল।

রহিমা একা হয়ে গেল। শিশুটিকে নিয়ে।

ছেলেটার নাম রাখা হলো বকু— মিরাজের পছন্দের নাম ছিল। কিন্তু রহিমা ডাকত "বাবু" বলে।

বাবু ছোটবেলা থেকেই অন্যরকম।

অন্যান্য বাচ্চারা যখন শান্ত হয়ে ঘুমায়, বাবু ঘুমাত না। রাত দুটো তিনটেতেও সে চিৎকার করত, হাত-পা ছুড়ত— যেন ভেতরে একটা ঝড় থামছে না। যখন একটু বড় হলো, এক জায়গায় বসে থাকত না পাঁচ মিনিটও। সবকিছু ছুঁয়ে দেখত। উল্টে দিত। ভেঙে ফেলত। যেন পৃথিবীর প্রতিটা জিনিস তাকে একসাথে ডাকছে।

আয়েশা বুয়া বললেন, "জিন ধরছে।"

মাঠের ডাক্তার বললেন, "অপুষ্টি।"

একদিন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ক্লিনিকে রহিমা ছেলেকে নিয়ে গেল। সেখানে একজন তরুণ ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় দিলেন। তারপর রহিমাকে ডেকে বললেন, "মা, আপনার ছেলের ADHD আছে। Attention Deficit Hyperactivity Disorder।"

রহিমা চেয়ে রইল।

"এটা একটা স্নায়বিক সমস্যা", ডাক্তার বললেন। "এতে বাচ্চার মনোযোগ ধরে রাখতে কষ্ট হয়, অতিরিক্ত সক্রিয় থাকে। কিন্তু সঠিক চিকিৎসায় এই বাচ্চারা অনেক ভালো করতে পারে।"

"রহিমা বলল চিকিৎসা মানে?"

"তখন ডাক্তার বলে ওষুধ আছে। আর থেরাপি। একজন বিশেষজ্ঞ শিশু মনোবিদের কাছে নিয়মিত নিতে হবে।"

রহিমা চুপ করে রইল। তারপর ধীরে বলল, "কত টাকা লাগবে?"

ডাক্তার একটু থামলেন। তারপর বললেন একটা মোটামুটি হিসাব।

রহিমা উঠে দাঁড়াল। কোনো কথা না বলে বাচ্চাকে কোলে নিল।

"মা, শুনুন," ডাক্তার বললেন।

কিন্তু রহিমা আর কথা শুনল না। সে হাঁটতে শুরু করল।

বস্তির একটি ঘরে একজন মা আর একটি শিশু।

মাসের ভাড়া বাকি। হাঁড়িতে চাল নেই। আর একটি ছেলে যার মস্তিষ্ক ঘুমায় না।

রহিমা সেই রাতে অনেকক্ষণ বসে রইল শিশুটির দিকে তাকিয়ে। বাবু ঘুমাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেও তার একটা হাত ঘুরছে— যেন স্বপ্নে সে কিছু একটা ধরতে চাইছে।

রহিমা ভাবল— কী স্বপ্ন দেখছ তুমি, বাবা?

এভাবে বাচ্চাকে দেখতে দেখতে রহিমা ও ঘুমিয়ে গেল। ঘরের অভাব অনটনের কারণে রহিমা মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া শুরু করল

সাহায্যের জন্য রহিমা যেখানেই গেল, একটাই উত্তর পেল— "পরে আসুন।"

প্রথমে গেল উপজেলা সমাজসেবা অফিসে। ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকল কাঠের চেয়ারে। তারপর একজন কর্মকর্তা বললেন, "ফর্ম নিন, পূরণ করুন, দুই সপ্তাহ পর আসুন।" দুই সপ্তাহ পর গিয়ে জানল ফর্মে একটা কাগজ কম— মৃত স্বামীর মৃত্যু সনদ চাই হাসপাতালের সিল দিয়ে। মিরাজ হাসপাতালে মারা যায়নি— রাস্তায়। সুতরাং সেই সনদ নেই।

গেল শহরের একটি এনজিওতে। সেখানে একজন বললেন, "আমরা শুধু বিধবা ভাতার জন্য রেফার করি। ADHD শিশুর চিকিৎসায় আমাদের ফান্ড নেই।"

গেল একটি মসজিদের কল্যাণ ফান্ডে। ইমাম সাহেব দিলেন পাঁচশো টাকা। বললেন, "আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো।"